

কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি এবং কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ভিন্নমত

আবু আহমেদ

সম্প্রতি সরকার কওমি মাদরাসার দাওরা হাদিসের একাডেমিক সার্টিফিকেটকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারাবিক ও ইসলামী অধ্যয়নের এমএ ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণা করেছে। এই দাবিটি কওমি মাদরাসাগুলোও এয়াবৎ করে আসছিল। প্রধানমন্ত্রী এতে সাড়া দিয়ে জনস্বার্থের পক্ষে একটি বড় কাজ করেছেন বলেই আমি মনে করি। এ কাজটি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী করলেও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হতেন। 'কওমি মাদরাসাগুলোকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমাজে কিছুটা হলেও ঐক্য স্থাপনে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমরা মনে করি। প্রধানমন্ত্রীর কাজ তো দেশের মানুষকে বিভক্ত করা নয়; বরং ঐক্যবদ্ধ করা



আমাদের বাড়ির সামনে একটি কওমি মাদরাসা ছিল, যেটি পরে সরকারের এমপিওভুক্ত হয়ে আধাসরকারি মাদরাসায় পরিণত হয়েছে। এখানে ওই মাদরাসাটি আছে, তবে আধাসরকারি হওয়ার কারণে স্থানীয় জনগণ আগের মতো ওই মাদরাসার সঙ্গে আর একাত্মবোধ করে না। আগে আশপাশের লোকজন ওই মাদরাসা চালানোর একটা গরজ অনুভব করত। এখন করে না। কারণ হলো, সরকারই যখন অর্থায়নের মূল দায়িত্বটি নিয়েছে তখন স্থানীয় জনগণ মনে করে এখন তো ওই মাদরাসা সরকারি নির্দেশেই চলেছে, তাদের কাজ কী। জানি না ওই মাদরাসা আগের মতো আলো ছড়ায় কি না। কারণ হলো সরকার হাত দিলে আলো ছড়ানোর কাজটি যেন ঝিমিয়ে পড়ে। যেমন করে পড়েছে আরো অন্য সরকারি মাদরাসাগুলোতে। ওই মাদরাসা যখন কওমি ছিল তখন মাদরাসার একটা অংশে সকালে 'মক্তব' বসত। আমি নিজেও তিন বছর ওই মক্তবে পড়েছি। আজ মনে হয় আমার বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে ওই তিন বছর মক্তবে পড়াটাই আমার কাছে অধিক মূল্যবান। কারণ হলো, ওই শিক্ষা আমাকে কোরআন পড়তে শিখিয়েছে; ওই শিক্ষা আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তাকে সিজদা করতে শিখিয়েছে। মক্তব বসত সকাল ৭টায়, আমরা সকালে উঠে মক্তবের দিকে ছুটে যেতাম, ছুটি হতো সকাল ৯টায়। বাড়ি ফিরে গোসল করে কিছু খেয়ে সকাল ১০টায় ওই মাদরাসাসংলগ্ন সরকারি প্রাইমারি স্কুলে যেতাম। তাতে আমাদের জীবনে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা এসে গিয়েছিল। একপর্যায়ে শুধুই প্রাইমারি স্কুলে যেতে লাগলাম, তারপর হাই স্কুলে, তারপর কলেজে। হাই স্কুল-কলেজে পড়তে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু মক্তবের পড়াটা পূর্ণভাবে বিনা পয়সায়। মক্তবের হজুররা (শিক্ষকরা) দেওবন্দফেরত, তাঁরা দিনি কাজের অংশ হিসেবে বিনা অর্থে মক্তবে পড়তেন। মৌসুমে তাঁদের কেউ সামান্য ধান দিয়ে সাহায্য করলে করত। আজ শুনি, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা নাকি অর্থের জন্য কোড়ি করান। কিন্তু সেই কালচার সেই সময় (১৯৫৭-৬০) ছিল না। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা সরকার থেকে সামান্য বেতন পেতেন। ওই নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতেন তাঁদের ছাত্ররা পড়ছে কি না। বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করানোর জন্য কিছু স্পেশাল রাস করানো হতো। তবে বিনা পারিশ্রমিকে। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ছাত্রদের বাবারাও শিক্ষকদের অনেক সম্মান করতেন। সেই শিক্ষকদের থেকে আদর্শ শেখা যেত। যতটা তাঁরা জানতেন উজাড় করে ছাত্রদের দিতেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই বিভিন্ন ধারায় চলে আসছে। ইংলিশ সাহেবরা ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেছেন। পুরনো হাই স্কুলগুলো আগে হাই ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। আবার তাঁদেরই সহায়তায় এক ধরনের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আলিয়া মাদরাসা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এর বাইরে আরেক ধরনের ইসলামী স্কুল ছিল, ওগুলো ছিল আলিয়া ও কওমি মাদরাসার মধ্যবর্তী, আলিয়া ও আলিয়া মাদরাসার আদলে গড়ে ওঠা অন্য মাদরাসাগুলোতে সরকারি বোর্ডের

নির্দেশিত সিলেবাস অনুসরণ করা হতো। কিন্তু কওমিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তাদের অধিকাংশই দেওবন্দ দারুল উলুমের সিলেবাস অনুসরণ করত। মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস অনেক পুরনো। মাদরাসা মানে স্কুল, যেখানে পাঠদান করা হয়। কালক্রমে, বিশেষ করে পরাধীনতার পরে ওসব মাদরাসা শুধু ধর্মীয় বিষয়গুলো পড়ানোয় মনোযোগ দেয়। ভাবি, ভারতে এসব মাদরাসার উত্থান হলো কেন, কিভাবে? যারা শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা বলতে পারবেন কেন-কিভাবে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে মাদরাসাপদ্ধতির শিক্ষা আমাদের সমাজে এলো। তবে আমার মনে হয়, ইংরেজ তাড়ানোর অনেক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিম নেতারা, বিশেষ করে আলোমের দিনরা মনে করলেন অন্তত ঈমান-আকিদা রক্ষার জন্য হলেও তাঁদের খাঁটি ইসলামী শিক্ষার দিকে যেতে হবে। দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস দেখলেও এ বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে। আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি স্থানে মাদরাসা শিক্ষা আছে। এবং সেই মাদরাসা শিক্ষা বলতে কওমি মাদরাসাকেই বেশি করে বোঝানো হচ্ছে। বাংলাদেশে এই শিক্ষাব্যবস্থা এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। পরাধীন ভারত থেকে কওমি ধাঁচের মাদরাসা পেয়েছে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে পেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কওমি মাদরাসার প্রসার কমেনি, বরং বেড়েছে। আগের কওমি মাদরাসাগুলো আধাসরকারি হয়ে যাওয়ার পর ওগুলোর পাশেই নতুন করে আরেক কওমি মাদরাসা গড়ে উঠেছে। আর আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তির এসব নতুন প্রতিষ্ঠিত কওমি মাদরাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সমাজের চোখে মাদরাসা বলতে কওমি মাদরাসাকেই বোঝানো হয়। এবং দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে, দিনি শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা কওমি মাদরাসায়ই দেওয়া হয়। দিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে আধাসরকারি মাদরাসাগুলোর ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তারা ওগুলোকে স্কুল মনে করে, শুধু নামেই ইসলামী আছে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, কোনো রকমের সরকারি দান-অনুদান ছাড়া শত শত কওমি মাদরাসা চলছে কিভাবে? এখানেই অনেকে ভাবতে তুল করছেন। অনেকে যেভাবে কওমি মাদরাসাগুলোকে ভিনদেশি কালচারে সিক্ত অচেনা-অজানা কথিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মনে করেন, আসলে আদতে সেগুলো তা নয়। এগুলোর পেছনে সমাজের সমর্থন না থাকলে তারা চলতে পারত না। অধিকাংশ লোকের ভাবনা হলো, প্রকৃত দিনি শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা এই মাদরাসাগুলোতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সমাজের মানুষ অতি সন্তুষ্টচিত্তে এসব মাদরাসায় তাদের দান-সদকা-জাকাতের অর্থ প্রদান করে। মানুষের বিশ্বাস হলো, কওমি মাদরাসাগুলোই এলেমদার-আমলদার আলেম তৈরি করেছে। অন্য মাদরাসাগুলো এলেমদার আলেম তৈরি করলেও আমলদার আলেম তৈরি করতে পারছে না। কওমি মাদরাসার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেন, দুনিয়ার জন্য তাঁদের শিক্ষা নয়। বরং পরকালকে পাওয়ার জন্যই তাঁদের এই শিক্ষা। হ্যাঁ, সমাজে ফেইথ-বেইজড বা ধর্মভিত্তিক বিদ্যার একটা চাহিদা আছে। এসব মাদরাসা সেই বিদ্যার

জোগান দিচ্ছে। এটাও ঠিক, আজ সমাজে আলোমের দিনের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আমরা আমাদের বাল্যকালে অনেক আলোমে দিনের কথা শুনেছি, যাদের সমকক্ষ এখন কোনো আলোম নেই। সামছুল হক ফরিদপুরী, কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাহার আলী, কক্সবাজারের মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ, শরিনার পীর আবু সাঈদ, মাওলানা কেরামত আলী, মাওলানা আবদুর রাজ্জাকসহ আরো অনেকের নাম আমরা শুনেছি। বয়স হওয়ার পর শুনেছি মুহম্মদউল্লাহ হাফেজী হুজুর, বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক ও শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের নাম। তাঁদের প্রায় সবাই কওমি মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং নিজেরাও কওমি মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন। আজ তাঁদের মাগের কোনো আলোম সমাজে আছে কি? কওমি মাদরাসায় ১৮ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ে। তারা এসেছে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে। পরিবর্তিত মতের কওমি মাদরাসাগুলো আশ্রয় দিচ্ছে এক অর্থে। তাই এসব মাদরাসা ও এসব মাদরাসায় যারা পড়ান-পড়েন তারা আমাদের সমাজেরই অঙ্গ। তাদের সহায়তা করা দোষের কিছু নয়। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী (মতিয়া আপা) যথার্থই বলেছেন, তাদের তো দূরে চলে দিতে পারি না। তিনি যেটা অনুভব করেছেন সেটা প্রকাশ্যে বলেছেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধে যে অনুধাবন প্রকাশ করেছেন, যেটা অতি যথার্থ। সম্প্রতি সরকার কওমি মাদরাসার দাওরা হাদিসের একাডেমিক সার্টিফিকেটকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারাবিক ও ইসলামী অধ্যয়নের এমএ ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণা করেছে। এই দাবিটি কওমি মাদরাসাগুলোও এয়াবৎ করে আসছিল। প্রধানমন্ত্রী এতে সাড়া দিয়ে জনস্বার্থের পক্ষে একটি বড় কাজ করেছেন বলেই আমি মনে করি। এ কাজটি অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী করলেও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হতেন। কওমি মাদরাসাগুলোকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমাজে কিছুটা হলেও ঐক্য স্থাপনে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে আমরা মনে করি। প্রধানমন্ত্রীর কাজ তো দেশের মানুষকে বিভক্ত করা নয়; বরং ঐক্যবদ্ধ করা। কওমি মাদরাসার সিলেবাস সেকেন্ডে—এটা অনেকেই বলেন। তবে শুধু ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেবাস তো সেকেন্ডেই হবে, এটা ই ষাভাবিক। বাংলাদেশে কোনো কওমি মাদরাসা এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি যে তারা গবেষণা করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারবে, যা ধর্মীয় বিষয়ে যেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এর আগেই বিশ্বাসীদের সামনে এসে গেছে, ওগুলোতে নতুন করে কিছু যোগ করতে পারবে। বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলো অনেকটা অনুসারী। তাতে তেমন অনুবিধা নেই। ফেইথ-বেইজড শিক্ষাটা তারা অনেকাংশে জোগান দিচ্ছে। কওমি মাদরাসার সিলেবাসের ক্ষেত্রে নতুন কিছু যদি সংযোজন-বিশোধন করতে হয়, সেটা তাদেরই করতে হবে। সরকার বা বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, কিছু অঙ্ক, কিছু বিজ্ঞান ও কিছু তথ্য-প্রযুক্তি তাদেরও পড়াতে হবে। সরকারের ওসব মাদরাসায় প্রত্যাকভাবে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না।

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়